ধান বীজ ও উৎপাদন পদ্ধতি

Rice seed and its production technology

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
গাজীপুর।

ধান বীজ ও উৎপাদন পদ্ধতি

রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়
ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম, ড. মোঃ ইসলাম উদ্দিন মোল্লা, ড. মোঃ ফজলুল ইসলাম ও মোঃ শাহাদাত হোসেন

কারিগরী সহায়তায়
বিআরকেবি ওয়ার্কিং গ্রুপ

আর্থিক সহায়তায়
বিআরকেবি-ব্রি-এনএটিপি-বিএআরসি উপ-প্রকল্প

পরিকল্পনা, গবেষণা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. মোঃ ইসলাম উদ্দিন মোল্লা

ডিজাইনে
মোঃ আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।

ধান বীজ ও উৎপাদন পদ্ধতি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য সমূহ	২
৩.	বীজের সুপ্ততা	৩
৪.	বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার উপায়	৩
৫.	ধান বীজের অংকুরোদগম	৩
৬.	বীজ ধানের শ্রেণীবিন্যাস	৪
৭.	বীজ উৎপাদন পদ্ধতি	৬
৮.	জাত নির্বাচন	৬
৯.	বীজ বাছাই	৬
১০.	বীজের পরিমাণ	৭
১১.	বীজ শোধন	৭
১২.	জাগ দেয়া	৭
১৩.	বীজতলা তৈরি	৮
১৪.	বীজতলায় বীজ বপন	৮
১৫.	বীজতলার যত্ন	৮
১৬.	চারা উঠানো	৯
১৭.	চারা বহন	১০
১৮.	রোপণের জন্য জমি নির্বাচন	১০
১৯.	জমি তৈরি	১০
২০.	চারা রোপণ	১০
২১.	চারা রোপণের নিয়ম	১১
২২.	রোপণ দূরত্ব	১১
২৩.	চারার বয়স	১১
২৪.	সার প্রয়োগ	১১
২৫.	সেচ ব্যবস্থাপনা	১২
২৬.	আগাছা দমন	১২
২৭.	রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন	১৩
২৮.	রগিং বা বিজাতীয় গাছ বাছাই	১৩
২৯.	ধানের জমি থেকে বীজ বাছাই প্রক্রিয়া	১৪
৩০.	ফসল কাটা	১৫
৩১.	বীজ ধান মাড়াই ও শুকানো	১৫
৩২.	বীজ ধান পরিষ্কার করন	১৬
৩৩.	বীজ ধান সংরক্ষণ	১৬

ধান বীজ ও উৎপাদন পদ্ধতি

১. ভূমিকা

খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র উপায়। আর ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উপকরণ হচ্ছে মানসম্পন্ন উন্নতমানের বীজ। বাংলাদেশে ভাল বীজের ব্যবহার অত্যন্ত অপ্রতুল। কারণ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভাল বীজের উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দেশের মোট বীজ চাহিদার মাত্র ২০% উন্নত মানের বীজ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া চাষি পর্যায়েও ভাল বীজের ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে গ্রহণীয় হয়নি।

বর্তমানে প্রায় ৯৫% কৃষকই নিজের উৎপাদিত বীজ দ্বারাই নিজের চাহিদা পূরণ করে থাকেন। বাস্তবে এ বীজ গুণগত ও মানসম্পন্ন নয় বিধায় তা ব্যবহার করে অধিক ফলন লাভ একেবারেই অসম্ভব। সাধারণত, কৃষকের রক্ষিত বীজ ধানই বীজ সরবরাহের প্রধান উৎস, তবে বেশির ভাগ কৃষকই তাদের রক্ষিত বীজ বদল করে না এবং বদল করার ব্যবস্থা (Exchange program) নাই বিধায় অনেক ক্ষেত্রে বীজের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়।

ভালবীজ ব্যবহার করলে ধানের ফলন শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশি পাওয়া যায়। ভাল বীজ ব্যবহার করে একদিকে যেমন কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন, তেমনি অন্যদিকে দেশের খাদ্য খাটতি পূরণে তা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া বীজের মান খারাপ হওয়ার কারণে কৃষকেরা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ বীজ ব্যবহার করেন বিধায় বীজ হিসাবে ধানের অনেক অপচয় হয়। ভাল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অপচয় রোধ করা সম্ভব।

বীজ উৎপাদন প্লট, ব্রি ধান৪৪

মাঠপর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল এবং বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অভাবই এর মূল কারণ। অতএব কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বর্দ্ধনের উন্নত পদ্ধতি এবং বীজ সংরক্ষণের আধুনিক কলাকৌশল সর্ম্পকে সচেতন হয়ে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে ধানের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ভালবীজ

খারাপ বীজ

২. ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য সমূহ

নিম্নে উল্লেখিত উপাদানগুলি ভাল বীজের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য , যেমন-

- পরিপুষ্ট বীজ
- উজ্জ্বল বর্ণের বীজ
- কমপক্ষে শতকরা ৮০টি বীজ গজায়
- দ্রুত ও মোটামুটি একসঙ্গে গজায়
- দাঁতে কাটলে কটকট শব্দ করে
- বীজে অন্য জাতের মিশাল নাই
- বীজে কোন দাগ নাই
- বীজের সাথে অপুষ্ট বীজ বা চিটা নাই
- বীজে গাছের কোন অংশের মিশাল নাই
- বীজে পোকার কোন ছিদ্র নাই
- রোগ-জীবানুমুক্ত বীজ
- বীজের সাথে আঁকাবাঁকা বীজ নাই
- বীজের সাথে আগাছার বীজের মিশাল নাই।

ভাল বীজ

সারণী-১ ফলনে ভাল বীজের প্রভাব

ক্রমিক নং	ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য	প্রভাব
১.	বিশুদ্ধ বীজ	আগাছা ও অন্যান্য ফসলের গাছমুক্ত বিধায় অধিক বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদন হয়
২.	উজ্জ্বল বর্ণের বীজ	পরিপক্ক এবং পুষ্ট বীজের ফলে অধিক অংকুরোধগম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়
৩.	পরিপুষ্ট বীজ	সতেজ ও সবল চারা উৎপাদন করে
৪.	উচ্চ অংকুরোধগম ক্ষমতা	কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক চারা উৎপাদন করে
৫.	দাগ মুক্ত বীজ	সুস্থ সবল চারা উৎপাদন হয়
৬.	অপুষ্ট বা চিটা মুক্ত বীজ	সুস্থ সবল চারা উৎপাদন হয়
৭.	পোকা দ্বারা ছিদ্র মুক্ত বীজ	সুস্থ সবল অধিক চারা উৎপাদন হয়
৮.	রোগ-জীবানু মুক্ত বীজ	সুস্থ সবল চারা উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি ঘটে
৯.	দাঁতে কাটলে কটকট শব্দ করে	শুকানো বীজ বিধায় পোকামাকড় ও রোগবালাই সহজে ক্ষতি করতে পারে না
১০.	উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য	গুণগত মানসম্পন্ন অধিক পরিমাণে উন্নত বীজ পাওয়া সম্ভব
১১.	মানসম্পন্ন ভাল বীজ ব্যবহারে	ভাল এবং অধিক ফসল এবং ফলনের নিশ্চয়তা থাকে।

"ভাল বীজে ভাল ফসল"

৩. বীজের সুপ্ততা

পূর্ণ জীবনী শক্তিসম্পন্ন (Viability) বীজ অংকুরোদগমের সকল অনুকূল পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও যদি অংকুরিত না হয় বা এক কথায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন বীজের এই বৈশিষ্ট্যকে সুপ্ততা বলা হয়। জাত ভেদে সুপ্ততার স্থায়ীত্বকাল ২-১২ সপ্তাহ। আবার কোন কোন জাতের সুপ্ততা মোটেই নেই, যেমন স্থানীয় আউশ ধানের জাত। এই ধান পাকা অবস্থায় মাঠে বৃষ্টি পেলে বা খলায় পালা অবস্থায়ই বীজ অংকুরিত হয়ে যায়।

বীজের সুপ্ততার উপকার/অপকার

- সুপ্ততার ফলে বৃষ্টির দিনে বা ভিজা আবহাওয়ায় ধান বীজ যখন মাঠে থাকে বা গাদা করে রাখা হয় তখন অংকুর গজায় না।
- অপরদিকে বীজে সুপ্ত অবস্থায় থাকলে ধান কাটার পর পর তা বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।
- অধিকাংশ উফশী ধানের জাতগুলোকে "দুর্বলভাবে সুপ্ত বীজ" হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে বিআর২৬ এর জাত সুপ্ততাবিহীন বীজ বিধায় ধান পাকার সাথে সাথে অংকুরোধগমের ক্ষমতা রাখে।

৪. বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার উপায়

শুকনো বীজ আবার ৪-৫ দিন রোদে (৫২° সেন্টিগ্রেড) দিলে অধিকাংশ বীজের সুপ্ততা ভেঙ্গে যায়। তবে তীব্র সুপ্ত বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গতে ৭-১০ দিন সময় লাগে।

৫. ধান বীজের অংকুরোদগম

উপযুক্ত পরিবেশে বীজের ভ্রূণ থেকে যে প্রয়োজনীয় অংশ অংকুরিত ও বর্ধিত হয়ে একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ বা চারা সৃষ্টির ইংগিত দেয় তাকে অংকুরোদগম বলে এবং বীজের অংকুরিত হওয়ার ক্ষমতাকে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বলে।

অংকুরিত বীজ

বীজ অংকুরোদগমের প্রয়োজনীয়তা

বীজে সঠিকমান বজায় আছে কিনা অর্থাৎ বীজ থেকে সুস্থ চারার মাধ্যমে স্বাভাবিক গাছে পরিণত হবে কিনা তা জানার জন্য অংকুরোদগম পরীক্ষা করা হয়। ধান বীজের ক্ষেত্রে অন্তত শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি অংকুরোদগম ক্ষমতা না থাকলে তাকে বীজ হিসাবে গণ্য করা হয় না।

বীজ অংকুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ

সুস্থ স্বাভাবিক ভ্রূণ অংকুরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিমিত পরিমাণে পানি, বায়ু (অক্সিজেন), তাপ ও সুপ্ততামুক্ত বীজ।

বীজের অংকুরোদগম হার জানার পদ্ধতি

নিম্নের দুইটি পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজে বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা করা যায়, যেমন-

- বীজ বাক্স বা পাত্র পদ্ধতি- একটি কাঠের বা প্লাস্টিক বা মাটির পাত্রে মাটি ভরে তার মধ্যে ২৪ ঘন্টা ভিজানো ১০০টি বীজ লাইন করে লাগাতে হবে। নিমানুযায়ী ২-৪ দিন পর ৪টি নমুনা থেকে গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।
- স্থানীয় বা দেশীয় পদ্ধতি- মাটির পাত্রে বা ভেজা চটের মধ্যে ২৪ ঘন্টা ভিজানো ১০০টি ধানের বীজ রেখে দিতে হবে। আগের মত ২-৪ দিন পর গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।

বীজ বাক্স

নিম্নোল্লিখিত ফরমুলার মাধ্যমে অংকুরোদগম হার নির্ণয় করা যায়-

$$\text{বীজের অংকরোদগমের হার} = \frac{\text{অংকুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{মোট ব্যবহৃত বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

অংকুরিত বীজ বা চারার মূল্যায়ন

- বীজ জাগ দেয়ার ৪-৫ দিনের মধ্যে শতকরা কত ভাগ বীজ গজিয়েছে গুনতে হবে এবং অংকুরোদগম হার নির্ণয় করতে হবে।
- দ্বিতীয় বার ৭-১৪ দিন পরে চারার মূল্যায়ন করে দেখতে হবে চারা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক ।

স্বাভাবিক চারাঃ যেগুলো সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক।
অস্বাভাবিক চারাঃ যেগুলো শিকড় বিহীন, বিকৃত এবং রোগাক্রান্ত।

সুস্থ সবল চারা

দুর্বল রোগাক্রান্ত চারা

৬. বীজ ধানের শ্রেণীবিন্যাস

বীজ অধ্যাদেশ (১৯৭৭) এবং বীজ আইন (১৯৯৮) ও বীজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে প্রকারভেদ করা হয় তাকে বীজের শ্রেণীবিন্যাস বলে। বীজ চার প্রকারঃ যথা ব্রিডার/প্রজনন/মৌল বীজ, ভিত্তি/ফাউন্ডেশন বীজ, প্রত্যায়িত/সাটিফাইড বীজ এবং মানঘোষিত/টিএলএস বীজ। বীজের বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা, গজানোর হার, রোগ ও পোকামাকড়ের উপস্থিতি, আকার এবং উজ্জ্বলতার উপর ভিত্তি করে এ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

ব্রিডার বীজ/প্রজনন/মৌল বীজ

কোন প্রজননবিদ নিজে কিংবা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যখন কোন জাতের বীজ উৎপন্ন করে তখন তাকে প্রজনন বীজ বলা হয়। সাধারণত জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান এ বীজের উৎপাদনকারী। প্রজনন বীজ কৌলিক সংক্রান্ত দিক থেকে শতকরা একশত ভাগ বিশুদ্ধ এবং পরিমাণে একেবার অল্প। এই বীজ ভিত্তি বীজের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লাইসেন্স প্রাপ্ত উৎপাদনকারীগণ এ বীজ গ্রহণ করতে পারেন। এই বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যয়ন উদ্ভিদ প্রজননবিদ এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ) কর্তৃক হয়ে থাকে। এ বীজের ট্যাগ এর রঙ সবুজ।

ব্রিডার বীজ ধান

ভিত্তি/ফাউন্ডেশ বীজ

সরাসরি প্রজনন বীজ বর্ধন করে ভিত্তি বীজ তৈরি করা হয়। ভিত্তি বীজ কৌলিকগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ। এই বীজের পরিমাণও খুব বেশি নয়। সরকারি খামারে, গবেষণা খামারে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বা কৃষকের মাঠে গবেষণা সহকারি এবং বীজ প্রত্যয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ভিত্তি বীজ উৎপাদিত হয়। লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এ বীজ উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারেন । এ বীজের ট্যাগ এর রঙ সাদা।

প্রত্যায়িত/সার্টিফাইড বীজ

ভিত্তি বীজ থেকে সরাসরি প্রত্যায়িত বীজ তৈরি করা হয়। প্রত্যায়িত বীজ তৈরি করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন জাতটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশুদ্ধতা নষ্ট না হয়। বর্ধিত বীজের গুণাগুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন সংস্থা সনদপত্র প্রদান করে থাকে। সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি উদ্যোগে বীজ উপাদনকারী এই বীজ কৃষকের জন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে থাকে। মূলত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ধান উৎপাদনকারী কৃষকই এ বীজ গ্রহণকারী ও ব্যবহারকারী। আমাদের দেশে বিএডিসি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কৃষকের (সংযোগ চাষি) মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন খামার আওতাধীন এলাকায় প্রত্যায়িত বীজ উৎপন্ন করে থাকে। এ বীজের এসসিএ প্রদত্ত ট্যাগ এর রঙ নীল।

মানঘোষিত/টিএলএস বীজ

এ বীজ ভিত্তি বা প্রত্যায়িত লেবেলকৃত বা অন্য কোন বীজ উৎস থেকে তৈরি। এ বীজ উৎপাদনের পর বীজ ব্যাগে বা মোড়কে বীজের সমুদয় মান, উৎপাদনকারীর নাম, ঠিকানা লেবেল করে বা প্যাকেটের গায়ে সুস্পষ্ট করে লিখে দিতে হয়। এ বীজের ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কোন প্রত্যয়ন বা প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযোজনের প্রয়োজন হয় না। তবে এ শ্রেণীর বীজের বীজমান অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজের সমতুল্য হতে হবে এবং এ বীজমান বজায় রাখার সকল দায়-দায়িত্ব বীজ উৎপাদনকারীর। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ) বাজার থেকে যে কোন উৎপাদনকারীর বীজ নমুনা সংগ্রহ পূর্বক পরীক্ষা করে মান অনুযায়ী না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। ধান উৎপাদনকারী কৃষকই মূলত এ বীজ গ্রহণকারী ও ব্যবহারকারী। এ বীজের ঘোষণাকৃত ট্যাগ এর রঙ হলুদ।

বীজমান সূচক

ক. মাঠ মানদন্ড

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	ব্রিডার বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১.	পৃথকীকরণ দূরত্ব (মিটার)	৩.০০	৩.০০	৩.০০
২.	অন্যান্য জাত (সর্বোচ্চ%)	০.০০	০.১০	০.৫০
৩.	অন্য ফসলের গাছ (সর্বোচ্চ%)	০.০০	০.১০	০.২০
৪.	ক্ষতিকারক আগাছা (সর্বোচ্চ%)	০.০০	০.০১	০.০২
৫.	রোগ (বীজ বাহিত জীবানু দ্বারা আক্রান্তগাছের সংখ্যা: সবোচ্চ%)	৫.০০	১০.০০	২০.০০

খ. বীজ মানদন্ড

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য	ব্রিডার বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১.	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন%)	৯৯.০০	৯৭.০০	৯৬.০০
২.	অন্য ফসলের বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক)	২/কেজি	৫/কেজি	১০/কেজি
৩.	আগাছার বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক)	২/কেজি	৮/কেজি	১০/কেজি
৪.	নিষ্ক্রিয় বস্তু (সর্বোচ্চ%)	১.০০	২.০০	৩.০০
৫.	অংকুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন%)	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০
৬.	আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ%)	১২.০০	১২.০০	১২.০০

মানঘোষিত বীজের বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রত্যায়িত বীজের অনুরূপ।

৭. বীজ উৎপাদন পদ্ধতি

মানসম্পন্ন বীজ পেতে হলে ধান গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদান সরবরাহ ও উপযুক্ত পরিবেশের যোগান দেয়া একান্ত প্রয়োজন। ধান চাষের জন্য যথাসময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ যেমন জরুরি তেমন সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এবং প্রয়োগ বিধির প্রতি লক্ষ রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। বীজ ধানের ভালো ফলন পেতে হলে জাত নির্বাচন থেকে ধান কাটা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ফসলের সঠিক পরিচর্যা করে যেতে হবে। নিম্নে বীজ উৎপাদনের ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হল-

৮. জাত নির্বাচন

মৌসুম, আবহাওয়া, জমি ও চাষের অবস্থা, নিজের প্রয়োজন ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী জাত নির্বাচন করা একান্ত জরুরি। কারণ সব জাত সব মৌসুম বা অবস্থার উপযোগী নয়। যে জাতের ধান যে মৌসুমের জন্য উপযোগী সে জাতের ধান বীজ হিসেবে উৎপাদন করা উচিত। নিম্নে মৌসুম ও চাষাবাদ পদ্ধতি মোতাবেক জনপ্রিয় জাত নির্বাচনের জন্য একটি ছক প্রদান করা হল।

মৌসুম ও চাষাবাদ পদ্ধতি	ধানের জাত
বোরো ও রোপা আউশ	বিআর১, বিআর৩, বিআর১৪, বিআর১৫, বিআর১৬ ও ব্রি ধান৫৫
শুধু বোরো	বিআর১৮, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৩৬, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫০ ও ব্রি ধান৫৮
শুধু বোনা আউশ	বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ব্রি ধান৪২ ও ব্রি ধান৪৩
বোনা ও রোপা আউশ	ব্রি ধান২৭
শুধু রোপা আউশ	বিআর২৬ ও ব্রি ধান৪৮
রোপা আমন	বিআর১১, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, ব্রি ধান৫৬ ও ব্রি ধান৫৭

বীজ উৎপাদনে ভাল ফলন পেতে হলে বোনার চেয়ে রোপণ পদ্ধতিতেই চাষাবাদ করা উচিত। এতে আন্তপরিচর্যা ও বিজাতীয় গাছ বাছাইয়ের কাজ সহজ ভাবে করা যায়।

৯. বীজ বাছাই

সুস্থ সবল চারা তৈরির জন্য রোগমুক্ত পরিষ্কার ও পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার করা উচিত। বীজতলায় চিটাযুক্ত বীজ বুনলে রোগাক্রান্ত চিটার জন্য চারা সহজেই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া পুষ্ট বীজের অভাবে বেশি ধান বুনেও পর্যাপ্ত সংখ্যক চারা পাওয়া যায় না। ভাল বীজ বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেমন-

হাত দিয়ে বীজ বাছাই

দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে নিন। এবার তাতে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট হালকা বীজ ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলুন। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। অথবা এভাবে বাছাইকৃত বীজ জাগ দিয়ে অংকুরিত করে বীজতলায় বোনা যেতে পারে। ইউরিয়া মিশানো পানি বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া কুলা দিয়ে খুব ভালভাবে ঝেড়ে পরিপুষ্ট বীজ বাছাই করা যায়।

১০. বীজের পরিমাণ

সাধারণত, ধানের জাত এবং অংকুরোধগম ক্ষতার উপর বীজের পরিমাণ নির্ভর করে। নিম্নে উল্লেখিত সূত্রের মাধ্যমে বীজের পরিমাণ নির্ণয় কর যায়।

$$\text{বীজের পরিমাণ} = \frac{\text{বীজের অনুমোদিত হার (কেজি/হেঃ)} \times \text{জমির পরিমান (হেঃ)}}{\text{বীজের অংকুরোদগম হার}} \times ১০০$$

জাত ও মৌসুম ভেদে রোপণ পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদনে হেক্টরে ২০-৩৩ কেজি অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ২.৭-৪.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। (এক হেক্টরের সমান ৭.৫ বিঘা)।

১১. বীজ শোধন

ভাল এবং রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন করতে বীজ বপনের পুর্বে বীজ শোধন অপরিহার্য। ধানের এমন কতকগুলো রোগ আছে যা বীজের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং এই বীজ বপন করলে পরবর্তী ফসল রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বীজ বপন করার পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হয়। সাধারণত ধানের ছত্রাকজনিত রোগ বীজের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। তাই ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিলে ছত্রাকজনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বীজ শোধন পদ্ধতি:

বাছাইকৃত ভিজা বীজ কাপড় বা চটের ব্যাগে ভরে ঢিলা করে বেঁধে নিন। এবার প্রতি কেজি বীজের জন্য এক লিটার পানি এবং তিনগ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন/নোইন/ইভাজিম/গিলজিম/টপসিল প্লাস/হেডাজিম/সালফানেট এর যে কোনটি একটি পাত্রে মিশিয়ে নিন। বীজের পোটলাটি ১২ ঘন্টা মিশ্রিত পানিতে ভিজানোর পর পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৬-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। এভাবে বীজ শোধনও হবে এবং সঠিক ভাবে ভিজেও যাবে। এরপর বীজের পোটলাটি পানি থেকে তুলে ইট বা কাঠের টুকরার উপর ঘন্টাখানেক রেখে পানি ঝরিয়ে নিন।

বীজ শোধন পদ্ধতি

১২. জাগ দেয়া

একটি বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২/৩ স্তর শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের পোটলাটি রাখুন এবং আবারও ২/৩ স্তর শুকনো খড় দিয়ে তার উপর ইট বা কাঠ অথবা অন্য কোন ভারী জিনিস দিয়ে চাপা দিয়ে রাখুন। এভাবে জাগ দিলে আউশ এবং আমন মৌসুমে ৪৮ ঘন্টা এবং বোরো মৌসুমে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ভাল বীজের অংকুর বাহির হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

১৩. বীজতলা তৈরি

ভিজা কাদাময় বীজতলা বীজ উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী। পানিতে ডুবে যায় না বা গাছের ছায়া পড়ে না এমন জায়গা বীজতলার জন্য বেছে নেয়া দরকার। বেলে মাটিতে বীজতলা না করাই ভাল কারণ তাতে পানি ধরে রাখা কষ্টকর। তাছাড়া খরায় সেচের পানি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বীজতলার জমিতে প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে ২/৩টি চাষ ও মই দিয়ে অন্তত ৭-১০ দিন জমিতে পানি আটকে রাখা দরকার। এর ফলে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে মাটির সাথে মিশে সারের কাজ করবে। তারপর চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। দুই বেডের মাঝে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দুই পাশের মাটি তুলে বেড তৈরি করা যায়। এরপর বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপটা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টা পর বীজ বোনা উচিত। বীজতলা তৈরির জন্য দুই বেডের মাঝের মাটি তুলে যে নালা তৈরি হয় তা খুবই দরকারী। এ নালা যেমন সেচের কাজে লাগে তেমনি পানি নিষ্কাশনেও কাজে লাগে। তাছাড়া সার কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের সময় তা দিয়ে সহজে চলাচল করা যায়।

বীজতলা সমানকরণ

১৪. বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলায় বীজ বপন

প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় ৮০ গ্রাম বীজ বোনার জন্য উপযুক্ত । যদি বীজতলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে তবে এ বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রতি বর্গমিটার ১০০ গ্রাম করা যেতে পারে। এ বাড়তি বীজের জন্য চারার গুণাগুণ নষ্ট হয় না এবং অল্প জায়গায় চারা তৈরি করে বেশি জমিতে রোপণ করা যায়। তবে বীজের পরিমাণ যত কম হবে বীজতলায় আগাছার পরিমাণ তত বেশি হতে পারে। এ সব বিষয় বিবেচনায়, প্রতি বর্গমিটারে ১৫০ গ্রাম পর্যন্ত বীজ বোনা যেতে পারে। প্রতি গর্তে ২-৩টি চারা রোপণ করলে এবং সারি থেকে সারি ও গুছি থেকে গুছির দুরত্ব যথাক্রমে ২০-২৫ ও ১৫ সেন্টিমিটার হলে এক বর্গমিটার বীজতলার চারা দিয়ে ২০-৩০ বর্গমিটার জমি রোপণ করা যায়।

১৫. বীজতলার যত্ন

সুস্থ ও সবল চারা পেতে হলে বীজ বপনের পর বীজতলার বিশেষ যত্ন নেয়া দরকার। বীজ বেডের উপরে থাকে বলে পাখিদের নজরে পড়ে। তাই বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নালা ভর্তি করে পানি রাখতে হবে। বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয়। এ কারণে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডাজনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড়-বাড়তি ভাল হয়।

বীজতলায় পলিথিন ব্যবহার

সেচঃ বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ রোধ করা যায়। বীজতলা শুকিয়ে গেলে শিকড় বেশি বড় হয়ে যায় এবং চারা তুলতে কষ্ট হয়।

পানি নিষ্কাশনঃ বীজতলায় পরিমিত পানি রাখতে হবে। অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে চারার বাড়-বাড়তি কমে যায় এবং চারা দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝে জমে থাকা পানি বের করে নতুন পানি দিলে চারা সবল হয়।

আদর্শ বীজতলা

সার প্রয়োগঃ উর্বর ও মাঝারি উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করলে কোন সারের প্রয়োজন হয় না। অনুর্বর ও সল্প উর্বর জমিতে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি গোবর বা পচা আর্বজনা সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া যদি চারা হলদে হয়ে যায় তবে চারা গজানোর দুই সপ্তাহ পর প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর বীজতলায় পানি ধরে রাখা উচিত। বোরো মৌসুমে অনেক সময় শীতে চারা লালচে বা হলদে হয়ে যায়। এ অবস্থায় বীজতলায় প্রয়োজনীয় পানি রাখা দরকার।

বীজতলায় পানি ধরে রাখা

১৬. চারা উঠানো

চারা উঠানোর আগে বীজতলায় বেশি করে পানি দিতে হবে যাতে বীজতলার মাটি ভিজে একেবারে নরম হয়ে যায়। যত্ন সহকারে বীজতলা থেকে চারা উঠাতে হবে যাতে চারার কান্ড বা গোড়া ভেঙ্গে না যায়। টেনে হেঁচড়ে চারা তোলার পর আছাড় দিয়ে মাটি পরিষ্কার করলে চারার খুবই ক্ষতি হয় এবং রোপণের পর চারার বাড়-বাড়তির বিলম্বিত হয়। সে জন্য চারা উঠানোর পর ওই চারার পাতা দিয়ে আটি বাঁধাও উচিত নয়। শুকনো খড় ভিজিয়ে আটি বাঁধতে হবে।

যত্নসহকারে চারা উঠানো

১৭. চারা বহন

বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কান্ড মোড়ানো পরিহার করতে হবে। এ জন্য ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে চারা পরিবহন করা উচিত। বস্তা বন্দী করে চারা কোনক্রমেই বহন করা উচিত নয়।

চারা বহন

১৮. রোপণের জন্য জমি নির্বাচন

ভাল বীজ উৎপাদনে জমি নির্বাচন একটি প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বীজ উৎপাদনের জন্য পোকামাকড়, রোগবালাই, ছায়ামুক্ত, উর্বর ও সমতল জমি বেছে নেয়া বাঞ্ছনীয়। বীজ উৎপাদনের জন্য জমি খুব উর্বর বা অনুর্বর না হওয়াই ভাল। মাঝারি ধরনের উর্বর ও সমতল জমি বীজ উৎপাদনের জন্য উত্তম।

১৯. জমি তৈরি

জমিতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে মাটির প্রকার ভেদে ২-৩টি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে কাদাময় হয়। জমি উঁচু নিচু থাকলে মই ও কোদাল দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে, সময়মত এবং উত্তমরূপে জমি তৈরি করলে প্রাথমিক ভাবে যেসব আগাছা জন্মায় তাদের দমন করা সহজ হয়।

ভাল ভাবে জমি তৈরির উপকারিতা-

- উত্তমরূপে কাদা করা জমিতে সেচের পানি অপচয় কম হয়।
- প্রথম চাষের পর অন্তত ৭ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। তাতে জমির আগাছা, খড়-কুটা পচে গাছের খাদ্য তৈরি হয়।
- নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বাড়ে।
- জমি সমতল হয় এবং সেচের পানি জমিতে সমভাবে প্রয়োগ করা যায়।

জমি তৈরী

২০. চারা রোপণ

চারা রোপণ

আউশ মৌসুমে চারা রোপণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। ঠিকমত বৃষ্টি হলে বা সেচের সুবিধা থাকলে বৈশাখের প্রথমার্ধে চারা রোপণ করা যায়। দেরিতে আউশ ধান রোপণ করলে একই জমিতে আমন ধানের চাষ বিলম্বিত হয়। ফলে আমনের ফলন কম হয়। আমন মৌসুমের সকল জাতই শ্রাবণের মধ্যেই রোপণ করা দরকার। স্বল্প আলোক সংবেদনশীল জাতের ধান, যেমন বিআর১১ ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যায়। তাছাড়া বিআর২২, বিআর২৩ এবং ব্রি ধান৪৬ ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত রোপণ করা যায়। আমন ধান রোপণ যত দেরিতে হবে ততই ফলন তুলনামূলকভাবে কমতে থাকবে। অন্যদিকে বোরো ধান পৌষ ও মাঘ মাসের মধ্যে রোপণ করা উচিত।

২১. চারা রোপণের নিয়ম

রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা বাঞ্ছনীয়। ধানের চারা প্রয়োজন মত দূরত্ব অনুসারে সারি করে রোপণ করতে হবে। সারিতে রোপণ করলে প্রতিটি গুছি সমান ভাবে পুষ্টি পায় এবং পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমন সহজ হয়। রগিং বা বিজাত বাছাই-এর সুবিধার্থে প্রতি গুছিতে একটি করে চারা রোপণ করা দরকার।

সারিতে রোপণ

২২. রোপণ দূরত্ব

উফশী ধানের চারা মৌসুম ও জমির উর্বরতা ভেদে সারি থেকে সারি ২০-২৫ সেন্টিমিটার এবং গুছি থেকে গুছি ১০-১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা দরকার।

২৩. চারার বয়স

সাধারণত আউশে ২০-২৫ দিনের, রোপা আমনে ২৫-৩০ দিনের এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা উচিত। চারার বয়স বেশি হলে বীজ ধানের ফলন কমে যায়।

২০-২৫ দিনের চারা

২৪. সার প্রয়োগ

ভাল ফলনের জন্য সুষম সার ব্যবহার করা অপরিহার্য। অধিক ফলনের জন্য বিশেষ করে আবহাওয়া, মাটির উর্বরতা, ধানের জাত ও জীবনকালের উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা উচিত। ধান গাছের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকের কুশি গজানোর সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়ে। সর্বোচ্চ কুশি অবস্থা থেকে কাইচড়োর অবস্থায় গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পেলে প্রতি ছড়ায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা বাড়ে। ফলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।

ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা জমিতে কম সময় থাকে। তাই এ সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচড়োর আসার ৫-৭ দিন আগে দিতে হবে। বোরো মৌসুমে যে সব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার কম সে সকল জাতের জন্য বিঘায় ৩০ কেজি এবং ১৫০ দিনের বেশি জীবনকালের জাতের জন্য বিঘায় ৩৫ কেজি ইউরিয়া সার সমান তিন ভাগে ভাগ করে উপরে বর্ণিত তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। একই নিয়মে আউশ এবং আমন মৌসুমে বিঘায় ২৩ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রায়োগের সময় মাটিতে অবশ্যই প্রচুর রস থাকতে হবে। সবচাইতে ভাল হয় যদি ক্ষেতে ২-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাত বা উইডার দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিলে সার যেমন মাটিতে মিশে যায়, তেমনি আগাছা না থাকায় গাছ বেশি সার পায়। জমিতে বিঘা প্রতি ১১ কেজি টিএসপি, ১৫ কেজি এমওপি এবং ১৩ কেজি জিপসাম সার ছিটিয়ে শেষ চাষ শুরু করতে হবে। বালি মাটিতে পটাশ সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। তিন ভাগের দুই ভাগ জমি তৈরির শেষ সময় এবং এক-তৃতীয়াংশ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া উচিত। প্রতি বিঘায় ১৮ মণ শুকনো জৈব সার ব্যবহার করতে পারলে ইউরিয়া সারের পরিমাণ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ কম হবে। জৈব সার ব্যবহার করা সম্ভব হলে তা প্রথম চাষের সময়ই জমিতে সমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। যে জমিতে দস্তার বা গন্ধকের অভাব আছে সে জমি তৈরির সময় দস্তা বা গন্ধক সার ব্যবহার করতে হবে। যদি কোন কারণে তা ব্যবহার করা না হয়ে থাকে তবে গাছের গন্ধক বা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ বুঝে সার দিতে হবে।

২৫. সেচ ব্যবস্থাপনা

চারা রোপণের পর জমিতে পরিমাণমত পানি রাখতে হবে যেন চারা তলিয়ে না যায়। ধানের জমিতে সব সময় বেশি পানি ধরে রাখার প্রয়োজন নেয়। রোপণের সময় থেকে কুশি অবস্থার মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিপছিপে পানি থাকলেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে উন্নত এবং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সর্তক থাকা আবশ্যক। কাইচথোড় অবস্থায় (Panicle initaition stage) এবং গর্ভ অবস্থায় (Booting stage) মাটির রস বা পানির অভাব হলে ধানের সংখ্যা কমে যাবে এবং কিছু ধান আংশিক বা সম্পূর্ণ চিটা হয়ে যাবে। তাছাড়া বীজের মান রক্ষা কল্পে শিষ বাহির হওয়ার সময়, ফুল ফোটার সময় এবং দুধ অবস্থায় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি রাখতে হবে।

জমিতে ছিপছিপে পানি

শিষ বাহির হওয়ার সময় গাছের সব চেয়ে বড় ৪/৫টি উপরের পাতা কার্যক্ষম থাকে বিধায় বেশি পানির প্রয়োজন হয়। তাই উক্ত সময়ে অধিক সেচের প্রয়োজন হয়। ধানের চাল শক্ত হওয়া আরম্ভ হলে (কাটার ১৫-২০ দিন আগে) জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ধান পাকতে দেরি হয় এবং বীজের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। চিটা ধান রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল বিধায় অতি সহজে বীজের মান নষ্ট করে। সময়মত ও পরিমিত পরিমাণ সেচের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু রোগবালাই ও ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন করে বীজের মান রক্ষা করা সম্ভব।

ইউরিয়া সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি কমিয়ে উপরি-প্রয়োগ করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর আবার পানি দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। জমিতে পানি ধরে রাখলে দানাদার কীটনাশকের গুণাগুণ বাড়ে। আমন ধান ক্ষেত খরা কবলিত হলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে। সম্পূরক সেচের মাধ্যমে আমন ধানের ফলন শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বাড়ানো সম্ভব।

২৬. আগাছা দমন

আগাছা ধান গাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেএে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাছাড়া ধান গাছের চেয়ে আগাছা অধিক হারে বাড়তে পারে। এ জন্য ধানের ক্ষেতে আগাছা থাকলে ধান গাছের বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয় এবং ফলন কমে যায়। ধান বীজের সাথে আগাছার বীজ মিশে বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে। উপোরন্ত আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরোক্ষভাবে ধানের ও ধান বীজের ক্ষতিসাধন করে থাকে। সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের চেয়ে আউশ মৌসুমে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। চারা রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। তবে বীজধান উৎপাদনের জমি সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। রোপা ধানে হাত দিয়ে কমপক্ষে দু'বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমবার ধান রোপণের ১৫ দিন পর এবং দ্বিতীয়বার ৩০-৩৫ দিন পর । তরল, দানাদার ও পাউডার- এই তিন ধরনের আগাছানাশক পাওয়া যায়। তরল ও পাউডার জাতীয় আগাছানাশক পানিতে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হয় এবং দানাদার আগাছানাশক ইউরিয়া সারের মতো ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগকৃত জমিতে ৩০ দিন পর আর একবার হালকা হাত নিড়ানির প্রয়োজন হতে পারে। কিছু অনুমোদিত আগাছানাশক ও সেগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হল।

উইডার দিয়ে দমন

আগাছানাশক প্রয়োগ

আগাছানাশক	প্রয়োগের সময়	মাত্রা (বিঘা)	আগাছার ধরন (গ্রুপ)
ম্যাচেটি ৫জি	রোপণের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	৩.৩৩ কেজি	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
আর গোল্ড ১০ ইসি	রোপণের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	১৪.০০ মিলি	বড় পাতা ও সেজ
রনস্টার ২৫ ইসি	রোপণ/বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	২৬৭.০ মিলি	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
সিরিয়াস ১০ ডব্লিওপি	আগাছার ১-২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	২০.০০ গ্রাম	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
সাথী ১০ ডব্লিওপি	আগাছার ৩-৫ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	২০.০০ গ্রাম	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
সানরাইজ ১৫০ ডব্লিওপি	আগাছার ৩-৫ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	১৩.৩৩ গ্রাম	বড় পাতা, ঘাস, সেজ
প্যানিডা ৩৩ ইসি	রোপণের ২-৪ দিন পর্যন্ত	৩৩৩.৩ মিলি	বড় পাতা ও ঘাস

২৭. রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

বাংলাদেশে গড়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ধানের ফলন রোগবালাই ও ১৮ ভাগ পোকামাকড়ের দ্বারা নষ্ট হয়। এজন্য রোগবালাই ও পোকা দমনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। এ পর্যন্ত ২৬৬টি প্রজাতির ক্ষতিকর পোকা সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২০-৩০টি প্রজাতিকে ধানের প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসাবে গণ্য করা হয়। ক্ষতির মাত্রা সাধারণত পোকার প্রজাতি, পোকার সংখ্যা, উপদ্রুত এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ, উপদ্রুত ক্ষেতের বা তার আশেপাশের অবস্থা, ধানের জাত, ধানগাছের বয়স, উপকারী পরভোজী ও পরজীবি পোকামাকড়ের সংখ্যা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ধান ক্ষেতে ক্ষতিকর পোকার সাথে কিছু বন্ধু পোকা ও থাকে। তাই কীটনাশক প্রয়োগ করার চেয়ে সমন্বিত পোকা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা উচিত। কোন নিদিষ্ট অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণ প্রবণ এলাকার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত নির্বাচন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ৩১টি ধানের রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২টি ভাইরাস, ৩টি ব্যাকটেরিয়া, ২১টি ছত্রাক এবং ৩টি কৃমি দ্বারা সংঘটিত হয়। তবে, এদের মধ্যে ১০টি প্রধান রোগ মারাত্বক ভাবে ধানের ক্ষতিসাধন করে থাকে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বীজের গুণগত মান রক্ষার জন্য এসব রোগ দমন করা অপরিহার্য। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা নিলে স্বল্প ব্যয়ে রোগ দমন করা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ফলে গাছে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ দমনের পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে রোগ সনাক্ত করা। কারণ লক্ষণ দেখে রোগ সনাক্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৮. রগিং বা বিজাতীয় গাছ বাছাই

বীজ ধানের জমি থেকে সকল প্রকার বিজাতীয় গাছ, আগাছা এবং রোগাক্রান্ত গাছ বেছে ফেলাকে রগিং বলে। যে সকল গাছের আকার-আকৃতি, শিষের গঠন, ধানের আকার-আকৃতি, রঙ, শুঙ ও পাতা ধান পাকার সময় জমির অধিকাংশ গাছ থেকে একটু আলাদা সেগুলোই বিজাতীয় গাছ। মোট কথা নিদিষ্ট জাতের ধানগাছ ছাড়া অন্য যে কোন জাতের গাছ দেখা গেলেই তা গোড়া থেকে কেটে ফেলে দিতে হবে। প্রতি গুছিতে একটি করে চারা রোপণ করলে রগিং করা সহজ হয়। বীজ ধানের জমিতে অতিরিক্ত যে কাজটুকু করতে হয় তা হল রগিং। রগিং এর কোন শেষ বা সংখ্যা নেই। যখনই বিজাতীয় গাছ দেখা দিবে তখনই রগিং করতে হবে। তবে বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ে অন্তত তিনবার রগিং করা বিশেষ প্রয়োজন, যেমন-

রগিং বা বিজাতীয় গাছ বাছাই

প্রথমবার সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায়

Ÿ অপেক্ষাকৃত খাটো এবং লম্বা গাছগুলো
Ÿ অন্যজাতের গাছ
Ÿ ফুল এসে গেছে এমন গাছ
Ÿ আগাছা বিশেষ করে শ্যামা গাছ
Ÿ রোগ ও পোকা আক্রান্ত গাছ
Ÿ দূর্বল ধান গাছ
Ÿ সারির বাহিরের ধান গাছ।

ধানের কুশি অবস্থায় রগিং

দ্বিতীয়বার ধানের দুধ অবস্থায়

Ÿ পূর্বের মত সকল প্রকার গাছ এবং
Ÿ ফুল আসেনি এমন গাছ।

তৃতীয়বার ধান কাটার ৭-৮ দিন পূর্বে

Ÿ পূর্বের মত সকল প্রকার গাছ এবং
Ÿ শিষের রঙ অপেক্ষাকৃত ভিন্নতর এমন গাছ।

ধানের দুধ অবস্থায় রগিং

২৯. ধানের জমি থেকে বীজ বাছাই প্রক্রিয়া

বীজের জন্য আলাদা ধান চাষ না করেও ধানের জমি থেকে বীজ বাছাই করা যায়। বীজ বাছাই এর জন্য কৃষকের ক্ষেতে অবস্থিত ধান ফসল থেকে কাঙ্ক্ষিত গাছগুলো একটি একটি করে বাছাই বা ক্ষেতের ফসলের অংশ বিশেষকে বীজের জন্য বাছাই করা যেতে পারে।

প্রথম পদ্ধতিঃ ক্ষেতে অবস্থিত প্রতিটি গাছ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধ্যমত ক্ষেতের কিনারা বাদ দিয়ে ভিতর থেকে এমন গাছ বাছাই করতে হবে যেগুলো সঠিক জাতের এবং পুষ্ট ও সুস্থ। সহজ ভাবে সনাক্ত করণের জন্য বাছাই করা প্রতিটি গাছ কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করা উচিত। ক্ষেতে ফুল আসার আগে, ফুল আসার সময় এবং ফসল কাটার সময় যত্ন সহকারে গাছ বাছাই করা উচিত। বীজের জন্য প্রথমে চিহ্নিত বাছাই করা গাছ কাটতে হবে এবং পরে মাঠের অবশিষ্ট ফসল কাটা উত্তম। বীজের জন্য কেটে নেয়া গাছগুলো আলাদাভাবে রাখতে হবে যাতে একই ফসলের অন্য গাছের সাথে মিশে না যায়। বাছাই করা গাছগুলো আলাদা করে ভালভাবে মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকাতে হবে যেন বীজের মান ঠিক থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ প্রথমে নিজস্ব বীজ থেকে আনুমানিক এক কেজি পরিমাণ দাগ বিহীন পুষ্ট বীজ হাতে বাছাই করে নিতে হবে। বাছাইকৃত বীজগুলো আলাদাভাবে বীজতলায় বপন করতে হবে।

বাছাইকৃত ভাল বীজের জমি বা নিজের ধানের জমি থেকে বীজের চাহিদা অনুযায়ী একটি অংশ খুঁটি বা পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। ক্ষেতের মাঝ থেকে বা যতদূর সম্ভব ভিতর থেকে অংশ বিশেষ নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমি মোটামুটি রোগমুক্ত, ছায়াবিহীন ও সমতল হতে হবে। মোটকথা, নির্বাচিত অংশে গাছ সুস্থ সবল হতে হবে। বীজের জমির পাশে অন্য জাতের ধান থাকলে নির্বাচিত অংশটি তার থেকে অন্তত ৬/৭ হাত দূরে রাখতে হবে।

চিহ্নিত অংশটির প্রতি বিশেষ যত্নের সাথে উন্নত চাষাবাদ পরিচর্যা গ্রহণ করতে হবে। যেমন সঠিক মাত্রায় ও সময়মত সার উপরি প্রয়োগ, আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ইত্যাদি। তাছাড়া, ফুল আসার আগে, ফুল আসার সময় এবং ধান পাকার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে বিজাতীয় গাছ কেটে ফেলা যায়।

৩০. ফসল কাটা

জমিতে ধান পেকে গেলে ধান কাটার বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। এতে কিছু ধান ঝরে পড়তে পারে বা ধানের শিষকাটা লেদা পোকা এবং পশু পাখির আক্রমণ হতে পারে। শিষের অগ্রভাগ থেকে ধান পাকা শুরু হয়। মাঝে মধ্যে জমিতে গিয়ে ধানের পাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ আকার ধারণ করলে এবং শিষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে গণ্য করতে হবে। তখন আর দেরি না করে ধান কাটতে হবে। বীজ ধান কাটার পর পালা দিয়ে না রেখে ঐ দিনই মাড়াই করতে হবে।

সময়মত ফসল কাটা

৩১. বীজ ধান মাড়াই ও শুকানো

ধান মাড়াই করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নেয়া দরকার। কাঁচা খোলার উপর সরাসরি ধান মাড়াই না করে চাটাই, হোগলা বা পলিথিনের উপর ধান রেখে পা দিয়ে বা উপযুক্ত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে মাড়াই করা দরকার। এভাবে মাড়াই করলে ধান বীজের ক্ষতি কম হয় এবং ধান পরিষ্কার থাকে। বীজ ধান মাড়াই করার সাথে সাথে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ ধান মাড়াইয়ের পর অন্তত ৪-৫ বার রোদে শুকিয়ে নেয়া দরকার। আমন মৌসুমে রোদে শুকানো যায় তবে বোরো এবং আউশ মৌসুমে আবহাওয়া খারাপ থাকলে ড্রায়ারে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকা উচিত। শুকানো ধান দাঁতে কাটলে যদি কটকট শব্দ করে তা হলে বুঝতে হবে ঠিকমত শুকিয়েছে। বাদলা দিনে ধান মাড়াই করা ও শুকানো কষ্টকর । সে জন্য শিষ কেটে ছোট ছোট আঁটি করে ঘরের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে শুকানো যায়। তা না হলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুযোগ মত পরে অবশ্য রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে।

যত্নসহকারে ধান মাড়াই

যন্ত্রের সাহায্যে ধান মাড়াই

ড্রায়ারে ধান শুকানো

৩২. বীজ ধান পরিষ্কার করুন

বীজ ধান শুকানোর পর ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে যাতে খড়কুটা, চিটা, আগাছার বীজ ও বালি মাটি ইত্যাদি বীজের সঙ্গে মিশে না থাকতে পারে। এ কাজে কুলা বা ঝাড়ার যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩৩. বীজ ধান সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বীজ ধান ঠিকমত সংরক্ষণ না করলে একদিকে যেমন কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর নষ্ট করে অপর দিকে গজানোর ক্ষমতা কমে যায়, ফলে বীজ ধান থেকে আশানুরূপ সংখ্যক চারা পাওয়া যায় না। বীজ ধান আলাদাভাবে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ ধান সংরক্ষণের সময় নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে। যেমন-

- বীজ সংরক্ষণের আগে পরপর ৫/৬ দিন রোদে অথবা প্রয়োজনে ড্রায়ারের সাহায্যে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে যদি কটকট শব্দ করে তাহলে বুঝতে হবে বীজ ঠিক মতো শুকিয়েছে।
- পুষ্ট ধান বাছাই করে নিতে হবে। কুলা দিয়ে ঝেড়ে বা ১.৭৫-২.৫০ মিলিমিটার (জাতের উপর নির্ভর করে) ছিদ্র বিশিষ্ট তারের তৈরি চালনি দিয়ে বাছাই করে নেয়া যেতে পারে।
- বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। যে পাত্রে বীজ রাখা হবে তাতে যেন কোন ছিদ্র না থাকে। বীজ রাখার জন্য তেলের ড্রাম, বিস্কুট কিংবা কেরোসিনের টিন প্রভৃতি ধাতব পাত্র ব্যবহার করা ভালো। পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ধাতব পাত্র ব্যবহার করা সম্ভব না হলে মাটির মটকা, কলস বা মোটা পলিথিনের থলি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাটির পাত্র হলে, পাত্রের বাহিরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে দু'বার প্রলেপ দিতে হবে।
- রোধে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পাত্রটি সম্পূর্ণ বীজ দিয়ে ভরাট করে রাখতে হবে। যদি বীজের পরিমাণ কম হয় তবে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে।
- পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজের পাত্র মাচার উপর রাখা ভালো যাতে পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। গুদামে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত থাকতে হবে। স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় বীজ সংরক্ষণ করা উচিত নয়।
- সংরক্ষণ করা বীজ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাতে কোন প্রকার পোকামাকড় বা ইঁদুর ক্ষতি করছে কিনা। প্রয়োজনে বীজ বের করে মাঝে মধ্যে শুকিয়ে নিতে হবে।
- প্রতি মণ বীজ ধানে ১২০ গ্রাম নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে গোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না।

টিনের ড্রামে বীজধান সংরক্ষণ

প্লাস্টিকের ড্রামে বীজধান সংরক্ষণ